ANTORJATIK PATHSALA ISSN 2230-9594

চিন্তাভাবনার সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত এখন বাংলা ভাষায়

আন্তর্জাতিক পাঠশালা

জানুয়ারি - মার্চ ২০২২

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

আশা আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা

আন্তর্জাতিক
পাঠশালা

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২

প্রধান সম্পাদক
অমিত রায়

যুগ্ম সম্পাদক
কপোতাক্ষী সুর
শুভেন্দু দাশমুন্সী

পাঠশালা

পাঠশালা প্রোডাকসন্স
হাওড়া ।। পশ্চিমবঙ্গ

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়

ভা ষা চ র্চা

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

বরিশালের উপভাষার আন্বয়িক সংবর্তন : বিপর্যাস ৭

উ নি শ ও বি শ শ ত ক চ র্চা

প্রত্যুষ কুমার রীত

বাঙালি নারীচর্চার এক আলোকিত অধ্যায় ১৮

সা হি ত্য চ র্চা

কল্যাণ মজুমদার

অবন ঠাকুরের লেখা : গদ্যে ছবি আঁকা ৩৫

অর্ণব ঘোষ

যদুনাথ সর্বাধীকারীর চোখে বাঙালির হিমালয় দর্শন ৪২

উমানাথ ব্যানার্জী

সমরেশ বসু-র 'কিমলিস' ও 'শেকলছেঁড়া হাতের খোঁজে' :
শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও আত্মানুসন্ধান ৫৪

না ট্য ই তি হা স চ র্চা

লিলি ব্যানার্জী

গেরাসিম লেবেদেভের নাট্যদর্শন ও মননে বেঙ্গলি থিয়েটার ৬৭

অ র্থ নী তি চ র্চা

সিদ্ধার্থ সেন

গ্রামীণ ভারতে কৃষিকাজ এবং কৃষকসমাজের অর্থনৈতিক দূরবস্থা ৮০

সা হি ত্য চ র্চা

অবন ঠাকুরের লেখা : গদ্যে ছবি আঁকা

অবনীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার অন্যতম লক্ষণ সেখানে তাঁর শিল্পীসত্তার রেখাপাত। তাঁর গদ্যে প্রতিরূপ নির্মাণ করে এক চিত্রকলা। গদ্যভাষার সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন কল্যাণ মজুমদার।

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) আন্তর্জাতিক তথা আন্তর্জালিক পরিচয় একজন খ্যাতিমান ভারতীয় চিত্রশিল্পী, নন্দনতাত্ত্বিক এবং লেখক হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের জন্মগ্রহণের দশ বছর পরে পৃথিবীতে এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর প্রস্থান আবার রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের দশবছর পর। রবীন্দ্রনাথ যেমন লেখা থেকে আঁকায় প্রবেশ করেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা, তিনি আঁকা থেকে যাত্রা করেছেন লেখার দিকে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রথম ভারতীয় চিত্রশিল্পী। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সেখানেও বিষয় এবং বিন্যাসে, শিরোনামে ও সন্ধানে আনুপূর্বিক প্রভাব বিস্তার করেছে তাঁর চিত্রশিল্পীর মন ও মেজাজ। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহকে কালানুক্রমে উপস্থাপন করলে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার বিস্তার সম্পর্কে একটা সামান্য ধারণা পাওয়া যেতে পারে—*শকুন্তলা* (১৮৯৫), *ক্ষীরের পুতুল* (১৮৯৬), *রাজকাহিনী* (১৯০৯), *ভারতশিল্প* (১৯০৯), *ভূতপত্রীর দেশ* (১৯১৫), *নালক* (১৯১৬), *বাংলার ব্রত* (১৯১৯), *খাতাঞ্চির খাতা* (১৯২১), *চিত্রাক্ষর* (১৯২৯), *বুড়ো আংলা* (১৯৪১), *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী* (১৯৪১), *জোড়াসাঁকোর ধারে* (১৯৪৪), *সহজ চিত্র শিক্ষা* (১৯৪৬), *ভারত শিল্পের যড়ঙ্গ* (১৯৪৭), *আলোর ফুলকি* (১৯৪৭) ইত্যাদি।

পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ছোটদের কথা ভেবে অবনীন্দ্রনাথের লেখালেখির সূত্রপাত। এই নিবন্ধের লক্ষ্য অবনীনন্দ্রনাথের সুবিস্তৃত সাহিত্য সাধনা নয়। যারা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের সঙ্গে পরিচিত তারা জানেন যে, তাঁর লেখায় তাঁর চিত্রশিল্পী সত্তার প্রভাব কত গভীর। তাঁর প্রথম দিকে প্রকাশিত চারখানি ছোটদের জন্য লেখা গ্রন্থ *শকুন্তলা* (১৮৯৫), *ক্ষীরের পুতুল* (১৮৯৬), *রাজকাহিনী* (১৯০৯), এবং *নালক* (১৯১৬)-এর পাতায় পাতায় কীভাবে তিনি রঙতুলির বদলে শব্দে শব্দে ছবি আঁকলেন তা স্পষ্ট করাই এই নিবন্ধের লক্ষ্য—

> অবনীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতীয় চিত্ররীতির জনক বললে অত্যুক্তি তো হয়ই না, বরং সবটা বলা হয় না। চিত্রজগতে ভারতীয় শিল্পীর যে যথেষ্ট দেবার আছে, প্রাচ্য ও ইউরোপীয় মনের আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্থল ভারতীয় সমাজ থেকে এমন চিত্ররূপ উঠতে পারে যার কাছে দুই জগতের কৃতজ্ঞ হবার যথেষ্ট কারণ থাকবে, একথা অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে প্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়।[১]

এই চিত্রশিল্পী তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ *শকুন্তলা* (১৮৯৫) থেকেই বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র রীতির গদ্যভঙ্গিমার স্বাক্ষর রেখেছেন। একজন চিত্র শিল্পীকে যেমন একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে রঙ ও রেখার বিন্যাসের প্রতি, তুলির প্রতিটি আঁচড়ের প্রতি যত্নবান হতে হয়—অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে আছে তেমনি এক সচেতন চিত্রশিল্পীর যত্ন, তেমনি চিত্রময় বিন্যাস, যা আসলে তাঁর চিত্রময় কল্পনারই ফসল। শব্দে শব্দে তিনি যেন একটি দৃশ্যের জন্ম দেন। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে পাঠকের চোখের সামনে ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি দৃশ্য—

> মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মতো তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কত ছায়া।[২]

এই বর্ণনা পড়তে পড়তে পাঠক যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন মালিনীর স্বচ্ছ জলরাশিকে। নীল আকাশ রাঙা মেঘ মিলে ফুটে উঠল এক রঙিন স্নিগ্ধতা, যা আসলে ছবির গুণ। *রাজকাহিনী*-র প্রতিটি লেখায়ও আছে এমনই চিত্রময় কল্পনার বিস্তার—

> ...সুভাগা যেন শুনতে পেলেন চারদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল। তারপর গুরুগুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরের দেওয়াল লোহার দরজা যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন।[৩]

রঙ-তুলিতে আঁকা যেতে পারে পাখি, আঁকা যেতে পারে বাঁশি, আঁকা যেতে পারে আকাশ। কিন্তু পাখির গান, বাঁশির গান রঙ-তুলিতে স্পষ্ট করা সম্ভব হলেও সহজ নয়। অবনীন্দ্রনাথ সেই ছবি স্পষ্ট করলেন শব্দে শব্দে, কথায় কথায় সহজ সাবলীলতায়—

> এইভাবে প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিক ও লেখক হয়ে অবনীন্দ্রনাথ গোড়ায় হলেন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। সাহিত্যে যখন ঠেকে যেতেন বা ক্লান্তি আসত তখন চলে যেতেন ছবিতে, ছবিতে যখন আটকে যেতেন বা ব্যতিব্যস্ত হতেন তখন চলে যেতেন সাহিত্যে। সেই হেতু প্রায়ই তার ছবি ও গদ্য হত অভিন্নাত্মা। ছবিতে আসত সাহিত্যিক কল্পনা, বিষয়, মন। গদ্যে আসত চিত্রময় কল্পনা, নিছক চিত্ররূপ।[৪]

শকুন্তলা আমাদের খুব চেনা কাহিনি। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় বিদ্যাসাগরের গদ্যে শকুন্তলার আখ্যান পেয়েছি আমরা, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের *শকুন্তলা* একেবারে নতুন। খুবই অক্লেশে তার বাক্যের ছন্দে-শব্দে-বিন্যাসে এসেছে নতুন রূপ, নতুন কল্পনা, এ যেন রূপকথার নবজন্মের মতন ব্যাপার। এভাবে এক সম্পূর্ণ নিজের রচনারীতির উদ্ভব ঘটল বাংলা ভাষায়। বিষয় এবং ভাষা অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসে যেন পরস্পরের হাত ধরল—

> অবনীন্দ্রনাথের রচনার বিষয় ও ভাষা পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া এমন অখণ্ড রূপ পাইয়াছে যে বিশ্লেষণ করিয়া রচনার অবয়ব দুটিকে পৃথক করিয়া দেখানো যায় না। অবনীন্দ্রনাথের লেখাকে সত্য সত্যই বলিতে পারি তুলির লিখন।[৫]

শকুন্তলা'র গদ্যে যে ধর্মটি প্রধান হয়ে উঠেছে তা একান্তই তাঁর চিত্রধর্ম। এই লেখায় অবনীন্দ্রনাথ যেন রূপকথায় মুগ্ধ বালকের সামনে রূপকথার ছবি এঁকে রূপকথার দেশে আনন্দ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েছেন। শকুন্তলাকে যখন পতিগৃহে পাঠানো হবে তখনকার যে কাহিনি ভারতীয় জন-মানসে প্রচলিত তা এমনিতেই এক রমণীয় দৃশ্যরূপ। বলা হয়ে থাকে কাব্যের মধ্যে নাটক হল রমণীয়, আর নাটকের মধ্যে শকুন্তলা রমণীয়তায় শ্রেষ্ঠ। আবার সেই *শকুন্তলা* গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্ক যেখানে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে, তা হচ্ছে রমণীয়তায় সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই রমণীয় বিষয়কে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গদ্যকারকে অবলম্বন করতে হয় এক সতর্ক সচেতনতা। অবনীন্দ্রনাথ সেই কাজটিকেই করেছেন এত সহজ করে, এত আন্তরিক সাবলীলতায় যা একান্তই মনোমুগ্ধকর। এখানে কথার ছন্দে মিশছে কল্পনা। রূপকথার আবেশে মিশেছে রঙ ও রেখার কারুকাজ। তিনি এমন করে বলছেন যেন তা অনায়াসে হয়ে উঠছে রঙ তুলিতে আঁকা ছবি। কিন্তু কোনো স্থির ছবি নয়, তা যেন চলমান। আরও একটু এগিয়ে একে চলচ্চিত্র বললেও কিছু অত্যুক্তি হয় না—

> প্রিয়ম্বদা কেশর ফুলের হার নিলে, অনুসূয়া গন্ধ ফুলের তেল নিলে; দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আলতা দিলে, নতুন বাকল দিলে ; তবু তাতে মনে উঠল না। সখীর এ কী বেশ করে দিলে? প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রানি, তার কি এই সাজ? —হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, খোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরনে বাকল! হায়, হায়, মতির মালা কোথায়? হিরের বালা কোথায়? পরনে শাড়ি কোথায়? বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।[৬]

ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬) প্রচলিত রূপকথার এক নতুন প্রকাশ। এ যেন ভাবনা এবং কল্পনার এক অভিনব মিশ্রণ। এ তো গল্প নয়, যেন গল্পচিত্র। চেনা কাহিনির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ সঞ্চারিত করেছেন সজীবতার রঙ। শিশুর মনোলোকের এমন সহজ সন্ধান

বাংলা গদ্যে ইতিপূর্বে পাইনি আমরা সুয়োরানি দুয়োরানির চেনা গল্প অবনীন্দ্রনাথ সাজালেন নতুন রঙে, নতুন রেখায়—

> সন্ধ্যাবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীল জল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিম মুখে ভেসে গেল।[৭]

এই যে সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে ভেসে গেল সোনার মেঘের মতো, তা একান্তই কল্পনার পাখা মেলে মনকেও যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল এক স্বপ্ন-কল্পনার সোনার দেশে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে এরকম সোনা রঙের অবাধ ছড়াছড়ি। তিনি যেন সবটা মিলে তৈরি করেন এক সোনার ছবি। মাঝে মাঝেই তার ক্যানভাসে আসে আগুন বর্ণের অলঙ্কার। সোনালী স্বপ্ন-কল্পনার এ সকল ছবিতে স্নিগ্ধ রঙে আঁকা হয় স্নিগ্ধ আবেগ। যে আবেগ শিশু মনের স্বপ্ন রাজাকে হাজির করে পাঠকের চোখের সামনে। এ যেন এক রূপকথার সব পেয়েছিলর দেশ—

> মানিকের দেশে সকলই মানিক। ঘরের দেওয়াল মানিক, ঘাটের সান মানিক, পথের কাঁকর মানিক। রাজা সেই মানিকের দেশে সুয়োরানির চুড়ি গড়ালেন। আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, পরলে মনে হয় গায়ের রক্ত ফুটে পড়ছে। রাজা সেই মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে এলেন। সেই সোনার দেশে স্যাকরার দোখানে নিরেট সোনার দশগাছা মল গড়ালেন। মল জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিনকি, বাজতে লাগল যেন বীণার ঝংকার—মন্দিরার রিনিরিনি।[৮]

একবার নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিহাস করে বলেছিলেন অবন ঠাকুর ছবি লেখে। এই কথা যে কতদূর সত্যি তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি তাঁর লেখায়। তাঁর ছবিগুলি যেমন অপার সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলে ওঠে, তেমনি তাঁর কথাগুলিও অনায়াসেই হয়ে ওঠে ছবি। তিনি জানতেন—

> কী করে ধুসর বা গ্রে আর ব্রাউন রঙ অন্য উজ্জ্বল রঙের গৌণ-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে উজিয়ে দিতে হয়, কী করে এই ধরনের উজানোর মধ্যে দিয়ে ছাই ও ব্রাউনের জৌলুস তুলে, দ্যুতি, টোন, বিচিত্র বর্ণালিবিভঙ্গের মধ্যে দিয়ে, ছবিতে হীরা জহরতের ছটা আনতে হয়, অথচ তার মধ্যে বনেদী উজ্জ্বল কমনীয়তা,...[৯]

শকুন্তলা বা *ক্ষীরের পুতুল*-এর বেশ কিছুকাল পরে লেখা *রাজকাহিনি* (১৯০৯) এক অসামান্য রচনা। রাজপুত কাহিনির থেকেই অবনীন্দ্রনাথ সন্ধান পেয়েছিলেন ইতিহাসের রূপকথার। এখানে আরও এক ইতিহাসের সঙ্গে মিশেছে কল্পনার অদ্ভুত মায়া। আপাত অর্থে শিশু পাঠের ভঙ্গিতে লেখা হলেও যে-কোনো বয়সেই এর রস-গ্রহণ এক আনন্দ অভিজ্ঞতা। *রাজকাহিনি* গ্রন্থখানির ছত্রে ছত্রে আছে। ইতিহাসের পথে মানবিক মনের সন্ধান। এখানেও আছে শব্দে শব্দে সোনা রঙের ছড়াছড়ি—

> সেই দিন শেষ রাত্রে চিতোরের উপরে কেল্লার খোলা ছাদে পদ্মিনী গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন। নীল পদ্মের মতো তার দুটি সুন্দর চোখ, পাঠান শিবিরের দিকে-সেখানে ভীষ্মসিংহ বন্দি ছিলেন, সেই দিকে চেয়ে ছিল। আকাশ তখনও পরিষ্কার হয়নি, পূর্ব দিকে সূর্যের আলো সোনার তারের মতো দেখা দিয়েছে, এমন সময় দু-জন রাজপুত সর্দার পদ্মিনীর পায়ে এসে প্রণাম করলেন।[১০]

রানি পদ্মিনীর জহরব্রত নিয়ে ইতিহাস এবং কিংবদন্তীর নানা কথা রাজপুত ইতিহাসের। আনাচে-কানাচে নানা বেশে নানা বিশ্বাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথ *রাজকাহিনি*-তে ইতিহাসের সেই সূত্রকেই বিন্যস্ত করলেন রূপকথার অপূর্ব মায়ায়। আত্মবিসর্জনের এক বিষাদ গৌরব গাথা অবনীন্দ্রনাথের তুলির টানে ইতিহাসের ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিল স্নিগ্ধ মায়া। বিষাদের অঙ্গে যে ছড়িয়ে থাকে কত স্বপ্ন কত কল্পনার মায়া অবনীন্দ্রনাথের লেখনী তুলে ধরে তার রঙ ও রূপের প্রত্যেক খুঁটিনাটি। এ নিছক লেখা নয় বা এ ঠিক ঠিক ছবিও নয়। এ যেন এক স্বপ্ন-কল্পনার নতুন জগত। কেবল মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়—

> মন্দিরের ঠিক সম্মুখে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে রাজস্থানের প্রথম সুন্দরী রানি পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ করলে, "হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, এসো! পৃথিবীর অন্ধকার তার আলোয় দূরে যাক। হে অগ্নি, হে মহাতেজ, এসো! তুমি দুর্বলের বল, সবলের সহায়। হে দেবতা, হে ভয়ংকর, আমাদের ভয় দূর করো, সন্তাপ নাশ করো, আশ্রয় দাও। লজ্জা নিবারণ, দুঃখ বিনাশন, বহ্নিশিখা, তুমি জীবনের শেষ গতি, বন্ধনের মহামুক্তি![১১]

রাজপুত কাহিনির এই উপস্থাপনা ইতিহাসের সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেই জাগিয়ে তোলে মানবিক মহিমার এক নতুন রেখাচিত্র। আমরা এই কাহিনির ছত্রে ছত্রে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখি অবনীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমিক হৃদয়টি। তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনায় ছিল ভারতের আত্মার অনুসন্ধান—

> অবনীন্দ্রনাথ রাজপুত-কাহিনীতে যে নূতন রস সঞ্চারিত করিলেন সে হইল চিত্রশিল্পীর তুলির টানে উপজাত রেখা ও রঙের রূপরস, মোগল ও রাজপূত মিনিয়েচার চিত্র হইতেই বোধ করি অবনীন্দ্রনাথ রাজপুত-কাহিনীতে কৌতুহলী হইয়াছিলেন। রাজপুত-নারীর বিচিত্র বেশ, রাজপুত-পুরুষের ধৈর্য ও বীর্য এবং পূর্বাগত দেশপ্রেমের উদ্দীপনা তো ছিলই। অবনীন্দ্রনাথ ইহার আগে ভারতমাতার ও বঙ্গমাতার চিত্র আঁকিয়াছিলেন। সে চিত্র সেন্টিমেন্টাল ও অবান্তর। এখন তিনি ভারতীয় শিল্পরসের সূত্রে ভারতবর্ষকে অতীত ইতিহাসের মধ্যে খুঁজিতে লাগিলেন।[১২]

রাজকাহিনি-র পর পাওয়া গেল *নালক* (১৯১৬)। বুদ্ধজাতক-এর এক চেনা কাহিনি

অবনীন্দ্রনাথ উপস্থাপন করলেন নতুন রঙ ও রেখার বিন্যাসে। কপিলাবস্তুর রাজপরিবারের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি ঘরদোর, কপিলাবস্তু নগরীর প্রতিটি প্রজা অবনীন্দ্রনাথের শব্দ-ছবিতে হয়ে উঠল জীবন্ত। ইতিপূর্বে *শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল* বা *রাজকাহিনি*-তে যে সোনা রঙের ছড়াছড়ি দেখতে পেয়েছিলাম, *নালক*-এও সেই একই রঙ রূপ এবং রেখার সমাবেশ। সূর্যের আলো অবনীন্দ্রনাথের লেখায় ধরা দেয় নতুন রূপে নতুন ঔজ্জ্বল্যে। সূর্যের সাত রঙের যে রামধনু তা চিত্রকরের ছবিতে সহজলভ্য। সেই একই ছবি গদ্যে এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ—

> এবার পশ্চিমের দুয়ার দিয়ে অস্তাচলের পথ দিয়ে পশ্চিমমুখে মনোরথ চলেছে—সোনার রথ চলেছে—যেদিকে দিন শেষ হচ্ছে, যেদিকে সূর্যের আলো অস্ত যাচ্ছে। সেদিক থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে আসছে নিজের নিজের ঘরের দিকে। পাখিরা ফিরে আসছে কলরব করে নিজের বাসায়—গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। গাইবাছুর সব ফিরে আসছে মাঠের ধার দিয়ে নদীর পার দিয়ে নিজের গোঠে, গোধুলির সোনার ধুলো মেখে।[১৩]

তথ্যসূত্র :

১। মিত্র অশোক, *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতের চিত্রকলা,* দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ মে ১৯৯৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুলাই ২০১৪, কলকাতা, পৃ.-১০৪।

২। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *রাজকাহিনি,* শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংসদ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৩, তৃতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৭, কলকাতা, পৃ.-৫।

৩। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *রাজকাহিনি,* শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংসদ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১২, ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা, পৃ.-৬।

৪। মিত্র অশোক, *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,* প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৫।

৫। সেন সুকুমার, অভিনব-'ভারতী, ১ উপক্রম : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৭৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে, ২০০২, কলকাতা, পৃ.-১৬৫।

৬। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *শকুন্তলা,* প্রাগুক্ত, পৃ.-২১।

৭। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *ক্ষীরের পুতুল,* শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংসদ সংস্করণ, জুলাই ২০২১, দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০১৪, কলকাতা, পৃ.-৯।

৮। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *ক্ষীরের পুতুল,* প্রাগুক্ত, পৃ.-১১।

৯। মিত্র অশোক, *অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,* প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৬।

১০। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *রাজকাহিনি,* প্রাগুক্ত, পৃ.-৭৭।

১১। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *রাজকাহিনি,* প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৩-৯৫।

১২। সেন সুকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৬৩-১৬৪।
১৩। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *নালক*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২ চতুর্থ মুদ্রণ : জুলাই ২০১৬, কলকাতা, পৃ.-২৭।

সহায়ক গ্রন্থ তালিকা :

১। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *নালক*, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২, চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই ২০১৬।

২। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৪১, প্রথম আনন্দ সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০০৩।

৩। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *রাজকাহিনি*, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১২, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুলাই ২০১৭।

৪। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *শকুন্তলা*, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম সংসদ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৩, তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৭।

৫। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, *ক্ষীরের পুতুল*, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম সংসদ সংস্করণ : জুলাই ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৪।

৬। মিত্র অশোক, *ভারতের চিত্রকলা*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ মে ১৯৯৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুলাই ২০১৪।

৭। সেন সুকুমার, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০০২।

ড. কল্যাণ মজুমদার : বেলুড় লালবাবা কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক।